একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Mridul Dasgupta's Poetry: Social Perspective and the Position of Women

মৃদুল দাশগুপ্তের কবিতা: সমাজপ্রেক্ষিত ও নারীর অবস্থান

Name of the Author: **Antara Mondal**

Affiliation: **Ex Student of Bengali Department**

Presidency University, West Bengal, India

Abstract: The 1970s was a turbulent era in Bengal's politics. With the imposition of the Emergency by presidential order, the rise of the Naxalbari movement for farmers' rights, and the outbreak of the Bangladesh Liberation War, India was in a state of upheaval. When national stability gives way to unrest, it naturally impacts everyday life, and the shockwaves of such times are often captured in the works of poets and writers. Among the many literary figures who chronicled this era, Mridul Dasgupta stands out. This summary highlights the history of that period through a selection of his poems. Since the backdrop of most of his poetry involves political movements and rebellions, his work has significantly influenced society and culture. His writings reflect the domestic political instability of the time, the agony of partition, the status of women in society, and how the flames of rebellion united remote villages and major cities in a single chord of protest.

Keywords: Political Instability, Farmers' Revolt, Partition, Refugee, Naxalbari Movement, Liberation War, Helplessness

মৃদুল দাশগুপ্তের কবিতা: সমাজপ্রেক্ষিত ও নারীর অবস্থান

মৃদুল দাশগুপ্তের প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জলপাই কাঠের এসরাজ'। কাব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮০ সালে। কিন্তু এই কাব্যের কবিতাগুলি ১৯৭০-৭৯ খ্রিঃ এর মধ্যে লেখা হয়েছিল। তাই কবিতা রচনার দিক থেকে বিচার করলে কবি অনিবার্যভাবে সত্তর দশকের কবি। আর সত্তরের দশকের সমকালীন ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেইসময় ভারত রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। কবি রণজিৎ দাশ তাঁর 'কবিতার নার্সিসাস এবং সত্তর দশক' প্রবন্ধে সত্তর দশক সম্বন্ধে বলেছেন –

> "সত্তর দশক প্রত্যক্ষ এবং উত্তাল রাজনীতির দশক।
> নকশাল আন্দোলনের আগুনের ভিতর তৈরি হয়েছিল
> সত্তরের কবি মনের জটিল টেরাকোটা।।"[১]

সেই সময় চারিদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল। কৃষকদের প্রাপ্য অধিকারের দাবিতে কমিউনিস্টদের একাংশ নকশালবাড়ি আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছিল। শিলিগুড়ির কাছে একটা প্রত্যন্ত গ্রাম নকশালবাড়ি থেকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের ঢেউ সমগ্র বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। যে কোনো মূল্যে কৃষকদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে এটাই ছিল আন্দোলনকারীদের প্রধান সুর। এই আন্দোলনের ফলে একদিকে যেমন কৃষকদের স্বার্থ রক্ষিত হয়েছিল তেমনই অনেক সাধারণ নিরীহ মানুষ বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছিল। নকশালবাড়ি আন্দোলন একসময় আন্দোলন থেকে সন্ত্রাসে পরিণত হয়েছিল। যার ফলে এই আন্দোলনের ওপর থেকে সাধারণ মানুষ আস্থা, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। নকশালবাড়ি নামক আতঙ্ক তাদের মননকে গ্রাস করেছিল। নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষগুলি একসময় ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিল। দেশের সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। যে কোনো আন্দোলনের সূচনা হয় কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে কিন্তু যখন আন্দোলনকারীরা আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে সেই নির্দিষ্ট বিষয়কে উপেক্ষা করে আন্দোলন অব্যাহত রাখতে চায় তখন সেই আন্দোলনের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। নকশালবাড়ি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। এরই মধ্যে আবার ১৯৭৫-এর ২৫ জুন থেকে ১৯৭৭-এর ২১ মার্চ পর্যন্ত দেশে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। জরুরি অবস্থা জারি হবার কারণে অসংখ্য সাধারণ মানুষ বিনা দোষে জেলে গিয়েছিল। একাধিক মানুষের জটলা দেখলেই পুলিশ তাদেরকে শ্রীঘরে চালান করে দিত। তখন দেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের বিদ্রোহমূলক রচনা। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার ক্ষেত্রেও জারি করা হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসেবে ভারতবাসী এই পরাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। মেনে নিতে হয়েছিল দেশের প্রতি রাষ্ট্রের অবিচারকে। অর্থাৎ, এককথায় বলতে গেলে সাধারণ মানুষ তখন পরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়েছিল।

অন্যদিকে, আবার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল এই যুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের হলেও প্রতিবেশী দেশ হিসেবে এ দেশের ওপর তার প্রভাব পড়েছিল। অসংখ্য বাংলাদেশি নাগরিক তখন ভারতবর্ষে চলে এসেছিল অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে। অবশেষে অনেক শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। এককথায় সত্তরের দশক রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়। এরই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে অনন্য রায় লিখেছিলেন –

"কমরেড
আমি তোমাদের দেশে প্রকল্প
ও উৎপাদন, দিনযাপন ও গেরিলা কর্মসূচি,"[২]

যে কোনো দেশের যে কোনো পরিস্থিতি সেই দেশের সমগ্র জনজীবনের ওপর প্রভাব ফেলে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন জনজীবন একসময় হারিয়ে যায় কিন্তু সময়ের সাক্ষী হিসেবে থেকে যায় সেই সময়ে রচিত বিভিন্ন সাহিত্য। এজন্যই সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ বলা হয়ে থাকে। সাহিত্যের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি। বলা যায়, সাহিত্য সমকালীন সমাজকে ধারণ করে। কবি মৃদুল দাশগুপ্ত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জলপাই কাঠের এসরাজ' রচনার সময় বিষয়, কাহিনি এসব নিয়ে ভেবেছিলেন। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটির বিভিন্ন কবিতায় সমকালীন যুগ যন্ত্রণার ছাপ পাওয়া যায়। 'মুক্ত মানুষের পদ্য' কবিতায় তিনি এরই পটভূমিতে স্পষ্টতই ঘোষণা করেছেন -

"গরল আমি ডরাই না হে
বিষে আমি ভয় পাই না
আমি মৃদুল দাশগুপ্ত, আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি।"[৩]

'কবিতা সমগ্র'-তে তাঁর কাব্যকবিতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, "মৃদুল ইতিহাসকে গ্রহণ করেছেন, জীবনের মর্মকে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর কবিতার যুগধর্ম, যুগমর্ম যেমন, তেমনই মানবিক মূল্যবোধ, অন্তর্গত উষ্ণতা সূক্ষ্মভাবে স্তরে স্তরে ঢুকে গেছে।"[৪] কথাগুলি কবি এবং তাঁর কাব্য সম্পর্কে একেবারেই যথাযথ। সত্যই 'যুগধর্ম' এবং 'যুগমর্ম'-কে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি। তাই তাঁর কাব্যগুলিতে যুগধর্মের এবং যুগমর্মের ছাপ লক্ষ করা যায়। কবি মৃদুল দাশগুপ্ত রাজনীতি পচ্ছন্দ করতেন। আর রাজনীতি মানেই বলা যেতে পারে সমাজনীতি। কারণ সমাজকে বাদ দিয়ে রাজনীতি হতে পারে না। এজন্য তিনি সমাজকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কবি মৃদুল দাশগুপ্তকে একটি সাক্ষাৎকারে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে 'এখনকার কবিতায় কি সমাজ ও সময়চেতনার অভাব লক্ষ্য করেছেন?"[৫] তিনি এর উত্তরে জানিয়েছেন যে, "... কোন কবি কীসে রিয়্যাক্ট করছেন, সম্পূর্ণ তার নিজস্ব ভাবনার ওপর নির্ভর করে। যা কারো মনে হতে পারে, আমি এই কোলাহল থেকে বাইরে থাকব। এটা সংবেদনশীলতা নয়। তাছাড়া জীবনের নানা সময় নানা উপলব্ধি হতে

পারে।"[৬] (কবিজন্ম / দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২২) কবি মনে করেন কবিতা আত্মার উৎসরণ। সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে জোর করে কবিতা লেখা যায় না, যদি না সে আপনা থেকে ধরা দেয়। তিনি জীবনের নানা উপলব্ধি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কবিতার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সময়টা ১৯৭১ সাল। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে যুদ্ধ। ইতিহাসের পাতায় যা মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত হয়ে আছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় বহু মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে এসেছিলেন। এসেছিলেন বললে ভুল বলা হবে, বলা ভালো ভিটে মাটি, জন্মভূমি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, জন্মভূমি স্বর্গের থেকেও শ্রেষ্ঠ কিন্তু বহু পূর্ববঙ্গীবাসীকে সেই মাতৃসমা জন্মভূমিকে ছেড়ে আসতে বাধ্য করা হয়েছিল। চোখের জলে স্বদেশকে বিদায় জানিয়ে বিদেশে যাদের ঠাঁই নিতে হয় তাদের থেকে হতভাগ্য আর কেউ হতে পারে না। অনাথ আশ্রমে শিশুদের বড়ো হয়ে ওঠা আর জন্মভূমি ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পিতামাতা নেই এমন শিশুকে যেমন সমাজ 'অনাথ শিশু' নামে চিহ্নিত করে ঠিক তেমনই মাতৃভূমিহারা পূর্ববঙ্গীরা ভারতবাসীর কাছে চিহ্নিত হয়েছিল 'উদ্বাস্তু' হিসেবে। তারপর তাদের বাকি জীবনটা কেটে যায় স্বদেশের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে এবং উদ্বাস্তু পরিচয়ে। পরদেশকে আপন করতে করতে পরপারের ডাক এসে যায় কিন্তু আপন আর করা হয়ে ওঠে না। 'একজন ভারতীয় নিগ্রোর কবিতা'-তে কবি মৃদুল দাশগুপ্ত সেই দিকটিই তুলে ধরেছেন, ব্যক্ত করেছেন দেশভাগের যন্ত্রনা -

"আমার বাবা এসেছিলেন পূর্বদেশ থেকে,
(মাতৃভূমি ছেড়ে আসতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন)।"[৭]

দেশভাগের সময় আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলকেই অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছিল। বৃদ্ধ বৃদ্ধাদেরকে সীমান্তরক্ষীরা পদাঘাত করতেও দ্বিধা করেনি। তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে তাদের ঘটিবাটি সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সহায় সম্বলহীন পথের ভিখিরি করে দেওয়া হয়েছিল তাদের। সেই অমানবিক চিত্রটিও 'একজন ভারতীয় নিগ্রোর কবিতা' কবিতাটিতে কবি তুলে ধরেছেন এভাবে –

"সীমান্তে আমার ঠাকুমাকে বুটের লাথি মেরে
আমাদের থালা বাসন পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।" [৮]

স্বদেশের মধ্যে স্বদেশীদের জন্য কোনো স্থান নেই। তাই নিজদেশের মাটিতে ব্যর্থ আশ্রয়ের সন্ধানে তাদের অতিক্রম করতে হয়েছিল দীর্ঘ রক্তাক্ত পথ। অবশেষে ঠাঁইনাড়া হয়ে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল স্বদেশের সীমানায়। সীমান্তে তাদেরকে আরো একবার অত্যাচারিত হয়ে চোখের জলে স্বদেশভূমিকে শেষ বিদায় জানাতে হয়েছিল, এর থেকে হৃদয়বিদারক বোধহয় আর কিছুই হতে পারে না। যুদ্ধ, বিদ্রোহ, আন্দোলন এসব দেশবাসীর কখনই কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে এবং মানুষের কর্মফলে যখন তা নেমে আসে তখন এর পরিণতি হয় ভয়ংকর। মৃত্যুর মিছিল চলে দেশ জুড়ে। পথেঘাটে মৃতদেহের স্তূপ পড়ে থাকে। খুঁজে পাওয়া যায় না সৎকার

করার লোক। কাজেই যত্রতত্র পড়ে থাকা মৃতদেহগুলো একসময় ফসিলে পরিণত হয়। সত্তরের দশক এই মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী। কবি সেই করুণ দৃশ্যই ব্যক্ত করেছেন 'ফসিল' কবিতায় –

"সে দেখে যায় মানুষের কঙ্কাল
সার সার কাচের কফিন
কে তার গর্জন শোনে সত্তর দশকে এই আশ্চর্য শহরে।"[৯]

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ যখন নকশালবাড়ি আন্দোলনে কাঁপছে, তখন মৃদুল দাশগুপ্তের লেখায় উঠে এসেছে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আন্দোলনের পুনর্নির্মানের চিত্র। সেই সময়ের বিনয়, বাদল, দীনেশ, সূর্যসেন, সিধু, কানহু, চাঁদ, ভৈরব, মঙ্গল পান্ডে তারা তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ধ্বজা নিয়ে আবার ফিরে এসেছে অন্য নামে। সেদিন ছিল বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে বিপ্লব, আর আজ বিপ্লব দেশীয় শত্রুদের বিরুদ্ধে। সময় বদলেছে কিন্তু বিপ্লব বদলায়নি। সেদিনকার তোপ, বারুদ, বন্দুক, পিস্তল আজও ধরণীকে রক্তাক্ত করছে। তাই কবি 'আগামী' কবিতায় দেখিয়েছেন –

"বরানগরের গঙ্গার জল থেকে
আবার এসেছে উঠে
তিনশো তরুণ।"[১০]

নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময় যেহেতু দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল তাই তখন বহু আন্দোলনকারী জেলে বন্দী হয়েছিল। জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় অনেক বন্দী দেশের স্বার্থে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে শহীদ হয়েছিল। কিন্তু শহীদদের মায়েরা সারাজীবন তাদের সন্তানদের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনেছে। তাদের মায়ের মন কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি যে, তাদের সন্তানেরা আর কোনোদিন ফিরবে না। মানতে পারেনি যে, তারা এখন না ফেরার দেশের বাসিন্দা হয়ে গেছে। তাই কবি মৃদুল দাশগুপ্ত 'কোনও শহীদের মা-কে' কবিতায় সন্তানহারা মায়েদের ভাবমূর্তি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন –

"মানো না যে মরে গেছি, বোকা মেয়ে, এখনও মানোনি
তাই জেগে বসে থাকো, ভাবো এলো পলাশের দল।"[১১]

অন্যদিকে, মহাজনদের শোষণের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচানোর জন্য নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সমাজের সব স্তরের মানুষই কমবেশি এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। তবে এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য সবথেকে বেশি এগিয়ে এসেছিল যুবকেরা। তারা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ গুটিয়ে রেখে কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। শহর দাঁড়িয়েছিল গ্রামের পাশে। শহরের বিলাসবহুল জীবন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে তারা গ্রামে এসেছিল। বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গ্রামকে আপন করে নিয়েছিল। কৃষকদের দুঃখে সমব্যথী হয়েছিল। একসাথে শোষকদের বিরুদ্ধে, শোষিতদের পক্ষে লড়াই করার শপথ নিয়েছিল। কিন্তু একসময় তাদেরকে

আইনের চোখে অপরাধী হয়ে জেলখানায় বন্দি হতে হয়েছিল। আন্দোলনরত এবং জেলে বন্দি অনেক বিপ্লবী সেসময় শহীদ হয়েছিল। এইসব ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে বিপ্লবী সন্দেহে বন্দি কবি জয়া মিত্র লিখেছেন –

"দেশের আমার বুকে পাথর, মাথার পাথর পায়।
দৈত্য-দানব পিষছে গলা রক্ত শুষে মারছে গায়ে
বুকের মানিক নিচ্ছে কেড়ে রাখছে আঁধার পাতালপুরে
সাথীর ব্যথা মায়ের কান্না উঠছে যে তাই আকাশ জুড়ে।"[১২]

সন্তানের শহীদ হওয়ার ঘটনা যেমন কোনো মা মেনে নিতে পারে না, ঠিক তেমনই তার সহকর্মীরাও সাথীহারার বেদনায় ভেঙে পড়ে। আকাশ জুড়ে সন্তানহারা মা, সাথীহারা সহকর্মীর, সহযোদ্ধার হৃদয় বিদীর্ণ করা হাহাকার ধ্বনিত হতে থাকে। শোষকেরা চিরকাল সাধারণ মানুষদেরকে শোষণ করে আসছে। তারা মনুষ্যত্বহীন শ্রেণির অধিবাসী। তাদের অন্যায়, অত্যাচারের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখ, কষ্ট ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। রক্তচোষকের মতোই তারা শোষিতদের রক্ত শুষে নেয়। তাই যখন সাধারণ মানুষ সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আন্দোলনের পথ বেছে নেয় তখনও তাদেরকে শহীদ করে দেওয়া হয়। আর এভাবেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মূল্য দিতে হয় প্রতিবাদী কণ্ঠকে।

কবি উত্তম দাশ তাঁর 'শতাব্দীর বাংলা কবিতা'[১৩] সংকলনের দীর্ঘ ভূমিকায় লিখেছেন যে, সত্তরের দশকের কবিতার পাঁচটি বিভাগ। যথা - সমাজমনস্ক ও রাজনৈতিক মনস্ক, প্রকৃতিচেতনা, রোমান্টিকতা, অন্তর্মুখী ও অবচেতন মনের কবিতা। তিনি মনে করেন সমাজ ও রাজনীতি মনস্ক কবিদের মধ্যে আছেন মৃদুল দাশগুপ্ত,ব্রত চক্রবর্তী, কৃষ্ণা বসু প্রমুখ কবিরা। মৃদুল দাশগুপ্তের কবিতায় তিনি লক্ষ করেছেন 'অন্যায়ের প্রতিবাদী মেজাজ', 'বঞ্চনার স্মৃতি' আর নকশালবাড়ি আন্দোলনের অভিঘাত। মৃদুল দাশগুপ্ত পেশায় একজন সাংবাদিক। সাংবাদিক হবার সুবাদে তিনি দেশ এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন। সম্মুখীন হয়েছেন নানান বিপদ সঙ্কুল পরিস্থিতির। খুব কাছে থেকে দেখেছেন সামাজিক, রাজনৈতিক উত্থান পতন। গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন জীবনের অর্থ। সাংবাদিকতা পূর্ণ করেছে তাঁর কবিতার ঝুলিটি। সাংবাদিক জীবনের এই একটা লাভ তাঁর কবি জীবনকে তথ্যে তথ্যে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। পেশা তাঁকে তাঁর চরম প্রাপ্তি এনে দিয়েছিল। একজন কবির এর থেকে বেশি আর কি-ই বা চাওয়ার থাকতে পারে।

সত্তর দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলন ছিল মূলত কৃষি আন্দোলন। এর দীর্ঘ দিন পর একবিংশ শতকের প্রথম দশকে পশ্চিমবঙ্গের বুকে আরো এক বৃহৎ কৃষি আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। সমাজে কৃষকদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে কতখানি বঞ্চিত করে রাখা হয়, সমাজের উচ্চস্তরের মানুষদের দ্বারা তাদেরকে কতখানি শোষিত হতে হয় তা প্রমাণ করে এই বৃহত্তর কৃষি আন্দোলনগুলি। হুগলি জেলার সিঙ্গুরে কৃষকদের কৃষি জমিকে

কেন্দ্র করে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। কৃষি জমির ওপর শিল্পোন্নয়ন হতে দেবে না এবং শিল্পোন্নয়নের জন্য যেসব জমি নেওয়া হয়েছিল সেসব জমি ফিরিয়ে দিতে হবে - এটাই ছিল সিঙ্গুর কৃষি আন্দোলনের কৃষকদের প্রধান দাবি। কৃষকদের একমাত্র সম্বল কৃষি জমি। চাষবাসই তাদের প্রধান কাজ এবং জীবিকা নির্বাহের প্রধানতম উপায়। তাই যখন সেই কৃষিজমি গুলিই কেউ অধিগ্রহণ করতে আসে তখন একান্ত নিরূপায় হয়ে কৃষকদেরকে বেছে নিতে হয় আন্দোলনের পথ, বিদ্রোহের পথ। কিন্তু প্রতিবাদীদের কণ্ঠরোধ করার জন্যও শাসিতরা প্রস্তুত হয়েই থাকে। আর যার পরিণতি হয় ভংয়কর। এই সিঙ্গুর কৃষি আন্দোলনে সামিল হওয়া মানুষদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল তৎকালীন শাসকদলের কিছু মানুষ। অনেক প্রতিবাদী সাধারণ মানুষকে বীভৎসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। সেসময় এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সিঙ্গুরে। বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে কবি, সাহিত্যিক পর্যন্ত সমাজের সব স্তরের মানুষ এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কবি, সাহিত্যিকদের ধিক্কার ফুটে উঠেছিল তাঁদের রচিত সাহিত্যে। সমকালীন সাহিত্য আজও সিঙ্গুর আন্দোলনের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। এরই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি মৃদুল দাশগুপ্ত লিখেছিলেন 'ক্রন্দনরতা জননীর পাশে' কবিতাটি। সেখানে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ কবি বলেছেন –

"ক্রন্দনরতা জননীর পাশে
এখন যদি না-থাকি
কেন তবে লেখা, কেন গান গাওয়া
কেন তবে আঁকাআঁকি ?"[১৪]

এখানে 'জননী' বলতে কবি জন্মভূমিকেই বুঝিয়েছেন। একজন মমতাময়ী মা যখন দেখেন তাঁর সন্তানেরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করছে তখন তিনি দুঃখে ভেঙ্গে পড়েন, শোকে কাঁদতে থাকেন। ঠিক তেমনই আমাদের জন্মভূমি মা-ও তার সন্তানদের মধ্যে হানহানি দেখে কাঁদছেন। জন্মসূত্রে আমরা প্রত্যেকেই জন্মভূমির প্রতি দায়বদ্ধ। একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে কবিও নিজ জন্মভূমির প্রতি দায়বদ্ধ। জননীর দুঃখে তিনি তার পাশে দাঁড়াতে চেয়েছেন। তাঁর দুঃখে সমব্যথী হতে চেয়েছেন। যদি অসময়ে, জননীর দুঃখের দিনে জননীর পাশে থাকতেই না পারেন তাহলে এত লেখালেখি, গান গাওয়া , আঁকাআঁকি, এত আয়োজন সবই বৃথা হয়ে যাবে।

সিঙ্গুরে কৃষি আন্দোলনের সময় অনেক সাধারণ কৃষক প্রাণ দিয়েছিল। যারা সকলেই প্রকৃতই আমাদের ভাই। এক ভাই কখনই অন্য ভাইয়ের মৃত্যু সহ্য করতে পারে না। কবিও তা সহ্য করতে পারেননি। তাই তিনি ক্ষোভে, দুঃখে, শোকে, ক্রোধে বলেছেন –

"নিহত ভাইয়ের শবদেহ দেখে
না-ই যদি হয় ক্রোধ
কেন ভালোবাসা, কেন-বা সমাজ

কীসের মূল্যবোধ !"[১৫]

সমাজে নারীর স্থান এঁটো শালপাতার মতো। ব্যবহার করো এবং ছুঁড়ে ফেলে দাও। ভোগ্য পণ্য ও নারীর মধ্যে কোনো বৈসাদৃশ্য নেই। যতই সমাজের একাংশ বুলি আওড়াক না কেন যে, নারী-পুরুষের অধিকার সমান সমান, তবুও একথা এখনও পর্যন্ত জোর গলায় বলা যেতে পারে যে, ওটা শুধুমাত্র মুখের কথা, কাজের কথা নয়। যদি কাজের কথাই হতো তাহলে নারীরা নিরাপত্তার অভাবে ভুগত না। যদি তাই-ই হতো তাহলে 'নারী নিরাপত্তা', 'নারী সুরক্ষা' এই শব্দগুলো প্রাত্যহিক জীবনে বারবার ফিরে ফিরে আসত না। যেখানে একজন সাধারণ পুরুষের নিরাপত্তার প্রয়োজন পড়ে না, সেখানে একজন নারীর নিরাপত্তার বিষয়ে এত ভাবার প্রয়োজন কোথায় যদি নারী পুরুষ সমান সমান হয় তাহলে। কবি মৃদুল দাশগুপ্ত 'ক্রন্দরতা জননীর পাশে' কবিতায় নারীর সেই অসহায়, করুণ দিকটিই তুলে ধরেছেন –

"যে-মেয়ে নিখোঁজ, ছিন্নভিন্ন
জঙ্গলে তাকে পেয়ে।"[১৬]

সেদিন সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় যে মেয়েকে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছিল আজও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। সিঙ্গুর আন্দোলন একসময় থেমে গেছে কিন্তু নারীর ওপর পুরুষের এইরকম জঘন্য, অমানবিক, পাশবিক, নারকীয় অত্যাচার এখনও অব্যাহত আছে। তাই কবি জানতে চেয়েছেন এ হেন বর্বরোচিত ঘটনার বিচারের জন্য আমরা কি বিধাতার কাছে বিচার চেয়ে বসে থাকব? অপেক্ষা করব তার সঠিক বিচারের জন্য? তাই তিনি বলেছেন –

"আমি কি তাকাব আকাশের দিকে
বিধির বিচার চেয়ে ?"[১৭]

একজন স্বাভাবিক বোধসম্পন্ন মানুষের পক্ষে অন্যায়ের ন্যায় পাবার জন্য বিধাতার ওপর ভরসা করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা কখনই সম্ভব নয়। তাই একজন দায়বদ্ধ কবি হিসেবে তাঁর প্রতিবাদ কবিতার ভাষাতেই প্রকাশ পেয়েছে। তাই কবি আরো বলেছেন –

"আমি তা পারি না। যা পারি কেবল
সে-ই কবিতায় জাগে
আমার বিবেক, আমার বারুদ
বিস্ফোরণের আগে।"[১৮]

বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকের কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনিও দেখেছেন নারীত্বের অপমান। তাঁর 'মল্লিকার মৃতদেহ' কবিতাটি যেন 'ক্রন্দনরতা জননীর পাশে' কবিতাটিরই প্রতিরূপ। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'মল্লিকার মৃতদেহ' কবিতাটিতে জানিয়েছেন –

"মল্লিকার মৃতদেহ দেখতে পেয়েছি
চক্ষু বিস্ফারিত, দেহ ছিন্নভিন্ন, বুক
তখনো কি উষ্ণ ছিল মল্লিকার?
কার নখরের চিহ্ন মল্লিকার বুকে ছিল,
কে হত্যা করেছে তাকে, কিছুই জানি না।"[১৯]

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে কবি সুবোধ সরকারের 'শাড়ি' কবিতাটি। বর্তমান সময় ও সমাজের সাপেক্ষে 'শাড়ি' কবিতাটির ঘটনা খুবই বেদনাদায়ক। রাজনৈতিক দলাদলির কারণে তরুণ তাজা যুবকদের অকালে চলে যেতে হয়। যাবার পথে রেখে যেতে হয় বিধবা স্ত্রী, অনাথ শিশু, দুঃখী মা আর পরিবারের জন্য একরাশ দারিদ্র্যকে। এ তো গেল পরিবারটির অভ্যন্তরীণ দৃশ্য। কিন্তু এর বাহ্যিক দৃশ্য হৃদয়বিদারক। সদ্য বিধবা হওয়া শোকার্ত যুবতীটিকে হতে হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লালসার শিকার। তার জীবনের চরম পরিণতি বিভীষিকাময় হয়ে দাঁড়ায়। তাই কবি সুবোধ সরকার এরই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে লিখেছেন –

"একটি সদ্য নগ্ন বিধবা মেয়ে দৌড়াচ্ছে আর চিৎকার করছে, বাঁচাও
পেছনে তিনজন, সে কি উল্লাস, নির্বাক পাড়ার লোকেরা।"[২০]

নারীর ওপর ঘটা এরকম অমানবিক অত্যাচারের নীরব দর্শক হয়ে থেকে যায় সমাজ। মূক বধির হয়ে যায় তারা, যারা একসময় ওই অসহায় পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সমাজের মুখ থেকে মুখোশটা খসে পড়ে যায়। আধুনিক কবি শুভ দাশগুপ্তের 'আমিই সেই মেয়ে' কবিতাটিতেও মেয়েদের করুণ, অসহায়তার ছবিই ধরা পড়েছে। যে মা-কে একদিন প্রকৃতি বলে পুজো করা হয়েছিল, সেই মা-কেই যদি বাজারে বিক্রি হতে হয় তাহলে এর থেকে চরমতম অপমান আর কি-বা হতে পারে। বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন - "... কিন্তু, নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙ্গালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন আর বাঙ্গালি বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।"[২১] আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য যখন একজন মেয়েকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয় তখন সেই মৃত্যুটাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে নাটক বলে মনে হয়। শিক্ষিত, ভদ্র সমাজে নারীকে তার জীবনের চরম মূল্য পরিশোধ করতে হয় নিজের মৃত্যু দিয়েই।

সময় এবং সমাজসচেতন কবি মৃদুল দাশগুপ্ত। কবির জন্ম হয়েছিল বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে। জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি ইতিহাসের বড়ো বড়ো ঘটনাগুলি দেখেছেন। ছাত্রাবস্থায় যোগ দিয়েছিলেন নানা মিছিলে। তিনি দেশভাগ না দেখলেও প্রত্যক্ষ দেখেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের লড়াই। বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হতে দেখেছেন। দেখেছেন ছাত্র আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলন, দেশের জরুরি অবস্থা, সিঙ্গুরে কৃষি আন্দোলন। বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতাসীন থাকার পর কীভাবে সমূলে উৎপাটিত

হয়েছিল সেই ইতিহাসও তিনি দেখেছেন। নানান ঘটনার ঘনঘটায় তাঁর জীবন পূর্ণ। তা সত্ত্বেও, তাঁর কাব্য কবিতাগুলি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়ে নেই। স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত ভাবনাই ছিল তাঁর কবিতার বিষয়। ভাবনার ওপর ভর করেই তিনি কবিতা লিখেছেন। আর সেইসব কবিতাগুলিই হয়ে উঠেছে সমকালীন সময়ের জীবন্ত দলিল। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে কৃষকদের স্বার্থে যে নকশালবাড়ি আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তা পরবর্তীতে সন্ত্রাসের আকার নিয়েছিল। যার ফলে বহু সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। সিঙ্গুর কৃষক আন্দোলনেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। দেশের জরুরি অবস্থায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণটা দিতে হয়েছিল সেই সাধারণ মানুষকেই। অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে তাদের প্রাণের বিনিময়ে শাসক দল তথা রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি স্থাপন করতে হয়। আর স্বাধীন রাষ্ট্রে সেই সাধারণ মানুষকেই ব্রাত্য করে রাখা হয়, এটাই রাজনীতির নিয়ম। রাজনীতির নিয়ম কেবল সাধারণ মানুষকে ব্রাত্য করেই শেষ হয় না, শেষ হয় নারীর চিতার আগুনে। এক্ষেত্রে শুধু রাজনীতিবিদই নয় সমাজের ক্ষমতাধর ব্যক্তিরাও এগিয়ে আছে। তাদের পাশবিক ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে নারীকে আজ ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পথে, ঘাটে, মাঠে, জঙ্গলে পড়ে থাকতে হয়। শাস্ত্রে, লোকাচারে যাদেরকে মা বলে পুজো করা হয়, দেবী বলে সম্বোধন করা হয় তাদেরকেই প্রয়োজনের সামগ্রীর মতোই ব্যবহারের পর ছুঁড়ে ফেলে দেয় সমাজ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিকেরা তাঁদের বিভিন্ন রচনায় সমাজে নারীর অবস্থানটা ঠিক কোথায় তা দেখিয়ে গেছেন। তাই কবি মৃদুল দাশগুপ্তের বিভিন্ন কবিতায় সমাজের নানাদিকগুলি বারবার উঠে এসেছে।

তথ্যসূত্র :

১. মুখোপাধ্যায় তরুণ 'কবিতার মৃদুল এস্রাজ', প্ল্যাটফর্ম প্রকাশন, সিঙ্গুর, হুগলী, প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৪২৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৭
২. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২২
৩. দাশগুপ্ত মৃদুল 'কবিতা সমগ্র', সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৪
৪. দাশগুপ্ত মৃদুল 'কবিতা সমগ্র', সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৬
৫. মুখোপাধ্যায় তরুণ 'কবিতার মৃদুল এস্রাজ', প্ল্যাটফর্ম প্রকাশন, সিঙ্গুর, হুগলী, প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৪২৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৪
৬. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৪
৭. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৮
৮. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৮
৯. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৩৪
১০. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৬
১১. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৩৮
১২. সহায়ক ওয়েবসাইট: নকশালবাড়ি আন্দোলন ও বাংলা কবিতা sabyasachi.home.blog
১৩. মুখোপাধ্যায় তরুণ 'কবিতার মৃদুল এস্রাজ', প্ল্যাটফর্ম প্রকাশন, সিঙ্গুর, হুগলী, প্রথম প্রকাশ: মহালয়া ১৪২৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৮
১৪. সাহিত্যচর্চা উচ্চমাধ্যমিক বাংলা সংকলন, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত, মুদ্রণ ও বিপণনে দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪৭

১৫. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪৭
১৬. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪৭
১৭. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪৭
১৮. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪৭
১৯.বন্দ্যোপাধ্যায় দেবদুলাল, বর্মণ বিজয়লক্ষ্মী (সম্পাদক), ঘোষ অনীশ, ভট্টাচার্য পীতম(নির্বাহী সম্পাদক), 'বড়দের আবৃত্তির কবিতা', বোস্টন স্কুল অব্ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ২০০৩, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৭২
২০. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৫৯
২১. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার (সম্পাদক), 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাছাই গল্প', মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৪ ই এপ্রিল, ২০০৪, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৯২